হারিয়ে যাওয়া ডোডোর খোঁজে

শেখ মুস্তাক আমেদ

আজ থেকে শতবর্ষ আগে 'On grasshopper and cricket' কবিতায় John Keats বলেছিলেন, 'The Poetry of earth is never dead', যে শ্রুত অশ্রুত কীট পতঙ্গের কলতানের কথা ভেবে তিনি এই উক্তি করেছিলেন, নতুন শতাব্দীর আবির্ভাবে ওই সব কীট পতঙ্গের পত প্রজাতিই না বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে তার সঠিক হিসাব আজও মেলেনি। হয়তো আর মিলবেও না। কিন্তু থেকেছে এবং থেকে যাবে স্মৃতি সেইসব প্রাণীদের যারা একদা এই বিশ্ব চরাচরে বিচরণ করে গিয়েছে।

এই বিশ্বের আয়তন যেমন বিশাল, তেমনি তার প্রাণী সম্পদও বিচিত্র। বর্তমান বিশ্বের বুকে যে সমস্ত প্রাণী বিচরণ করতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর বাইরেও কতশত প্রজাতির প্রাণী ছিল এবং তারা হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে প্রকৃতির আকস্মিক অর্ন্তধান বা অন্য কোন কারণে। আবার বিলুপ্তির পথে রয়েছে এমন প্রাণীর সংখ্যাও কম নয়।

এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত প্রাণী বিশ্বের বুক থেকে চিরতরে 'বিলুপ্ত প্রজাতি' শিরোপায় আসীন ডোডো পাখি তাদের মধ্যে অন্যতম।

আফ্রিকার মরিশাস দ্বীপের হাঁস জাতীয় এই ডোডো পাখির বিলুপ্তির ঘটনা বড়ই বেদনা দায়ক এবং করুণ। ১৬৮০ সালের চিরকালের জন্য বিদায় নেয় সকলের আদরের এই ডোডো।

প্রাণী বিজ্ঞানের ইতিহাসে জানা যায়, ডোডোর বিবরণ সর্বপ্রথম বিশ্বের দরবারে হাজির করেন ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ স্যার টমাস হারবার্ট। ১৬২৭ সালে মরিশাস পরিভ্রমণে গিয়ে স্যার টমাস ডোডোকে আবিষ্কার করেন। তাঁর বিবরণ এইরূপ যে, স্থূলদেহী ডোডোর ওজন প্রায় পঞ্চাশ পাউন্ড (২৩ কিলো) এর মতো, তার ডানা জোড়া শিথিল এবং ডানায় সাজানো গোছা গোছা ডাউন পালক। একেবেঁকে তিনটি অসমান পালক লেজের কাছে। সমস্ত শরীর জুড়ে বিচিত্র রঙের সম্ভার। সেই রঙের মধ্যে কোথাও সবুজ, বাদামী অবার কোথাও বা হলুদ আকাশীরছটা। ছোট চোখ দুটি হীরক দ্যুতিময়। পা দুটি ছোট মাপের। হাঁটতো শ্লথ গতিতে। উড়তে পারেনা, এমন কি পারেনা দৌড়োতে। সুতরাং ধীর পদক্ষেপেই দ্বীপময় ঘুড়ে বেড়ানো ছাড়া ডোডোদের আর কোন উপায় ছিল না।

বলা দরকার, মরিশাস দ্বীপে সেই সময় কোনও মানুষের বাসভূমি ছিলনা। বাসা বাঁধেনি কোনও স্তন্যপায়ীও। এই দ্বীপ ছিল শুধুমাত্র পাখিদেরই বিচরণ ক্ষেত্র। অন্যান্য পাখিদের সঙ্গে (যেমন টিয়া, হাঁস, থ্রসি, পেঁচা, সারস, কাক ইত্যাদি) ডোডোও পরম নিশ্চিন্তে চরে বেড়াত।

কিন্তু এক সময় ভিনদেশি সওদাগরের জাহাজ ভিড়তে শুরু করল ওই দ্বীপে। আরব বণিক, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ বণিকদের পদচারণ ঘটলো মরিশাস দ্বীপে। নিরীহ পক্ষী প্রজাতির নিধন যজ্ঞ শুরু এখান থেকেই।

১৯৫৮ সালে মরিশাসের কোলে ওলন্দাজ সওদাগর কর্ণেলিয়াস ভন্‌নেকের জাহাজ ভিড়েছিল। সেই সময় জনৈক ওলন্দাজ নাবিক তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন, ''তাঁরা এই দ্বীপে যে ক'দিন ছিলেন সে কদিন কচ্ছপ আর গোলাপী - নীল ডোডোর মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করেছিলেন।

এ পর্যন্ত ডোডোরা শত বর্ষের আঘাতকে সহ্য করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু প্রমাদ গুণলো ইংরেজ বণিকরা উপনিবেশ গড়ে তুলতে লাগল যখন।

সেটা ষোড়শ শতকের চারের দশকের পর। ইংরেজ বণিকরা মরিশাস দ্বীপে তাদের সমাজ গড়ে তোলার জন্য বহু জন্তু - জানোয়ার সঙ্গে নিয়ে যায়। বিশেষ করে সারমেয়দের অত্যাচারে ডোডোদের বংশ কমতে থাকল। অসহায় নিরীহ ডোডোদের কামড়ে ধরে তাদের কণ্ঠ ছিন্ন করতে বেশি সময় নেয়নি ওইসব সারমেয়র দল।

ডোডোরা ইতি পূর্বে শত্রুর মুখোমুখি না হওয়ার কারণে তারা আত্মরক্ষা কৌশল জানত না। আর কৌশল না জানার ফলে স্থুলদেহ নিয়ে শত্রুর কাছ থেকে বেশিদূর পালিয়ে যেতে পারত না। ফলে সহজেই শত্রুর মুখে পড়তে হ'ত। এর পাশাপাশি মানুষের উদর পূর্তিতে ডোডোর মাংস কিন্তু সুস্বাদু নয় তিক্ত কর্কশ। তবু রেহাই ছিলনা।

একটা সময় এল যখন মরিশাস দ্বীপের আদি বাসিন্দা ডোডোদের সংখ্যা যত কমতে লাগল, ততটাই ওই দ্বীপে বাড়তে থাকল মানুষ ও অন্য স্তন্যপায়ী জন্তুর সংখ্যা। এভাবেই ডোডোরা হারিয়ে গেল পৃথিবীর বুক থেকে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ডোডো শুধু রয়ে গেছে প্রাণী বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতায় আর কিছু স্মৃতি পক্ষী প্রেমী এবং পক্ষী বিশারদদের কাছে স্মৃতিময় ইতিহাস।

আধুনা বিপন্ন প্রাণী প্রজাতির সঠিক সুরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য আবশ্যক বিলুপ্ত প্রাণী সমূহের অভিজ্ঞান ও তাদের বিলুপ্তির কারণ অন্বেষণ। এই পথ সঠিক গতিতে এগোলেই বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীদের বিলুপ্তি অভিশাপ রোধ করা সম্ভব।

তথ্য সূত্র

* The New Larousse Encyclopedia of Animal Life
* The Encycolpedia of Vanished Species
* পৃথিবীর বিলুপ্ত প্রাণী - ডঃ তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভিন্ন বিজান সাময়িক পত্র